কোনারকের সূর্যমুখী

কথোপকথন

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

পূর্ণেন্দু পত্রী

কথোপকথন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ৯

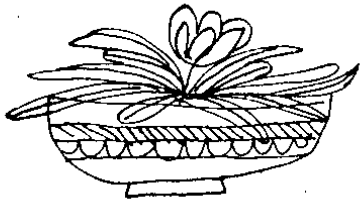

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৮১ মুদ্রণ সংখ্যা—২২০০ কপি
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৮৩ মুদ্রণ সংখ্যা—২২০০ কপি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মূল্য : ১০·০০

একদা কলকাতা নামের এই শহরে শুভংকর নামে ৪৫ বছর
বয়সী এক সদ্যজাত যুবক ভালোবেসে ফেলেছিল নন্দিনী নামের
এক বিদ্যুৎ-শিখাকে। গেরিলা-যুদ্ধের মতো তাদের
গোপন ভালোবাসাবাসির নিত্যসংগী ছিলাম আমি। আর
নিজের খাতায় রোজ টুকে রাখতুম তাদের
আবীর-মাখানো কথোপকথনগুলো। সেই শুভংকরের
বয়স এখন ৫০। সেই নন্দিনী হয়তো এখন বন্দিনী
নিদারুণ-সুখের কোনো সোনার পালংকে।
ওদের মাঝখানে নদী আর খেয়া দুটোই গেছে হারিয়ে।
একবার ভেবেছিলুম ঝড়ের অন্ধকারে উড়িয়ে দিই
টুকরো এইসব কাগজ। পরে মনে হলো, যারা ভালোবাসে,
ভালোবেসে জ্বলে, জ্বলে পৃথিবীর দিগন্তকে রাঙিয়ে দেয়
ভিন্ন এক গোধূলি-আলোয়, তাদের সকলেরই অনেক আপন-কথা,
গোপন-কথা রয়ে গেছে এর ভিতরে। এমনকি আমার
মৃত্যুর পরেও যাদের রক্তে শুরু হবে তুমুল শ্রাবণের চাষ-বাস,
তাদের মুখগুলোও ভেসে উঠলো চোখে। অগত্যা
ছিন্ন-ভিন্ন ঐ সব কাগজগুলোকে হেলাফেলায় মরতে দিতে
পারলাম না আর।

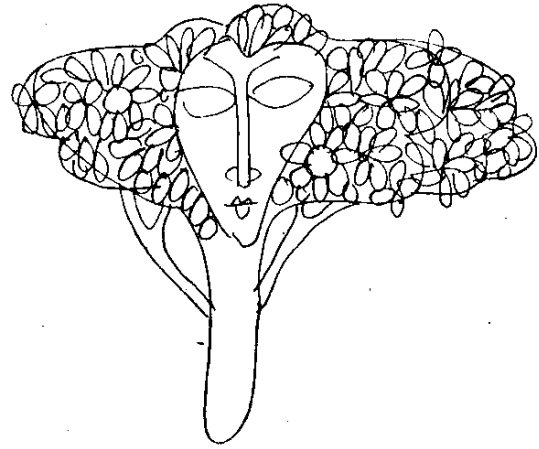

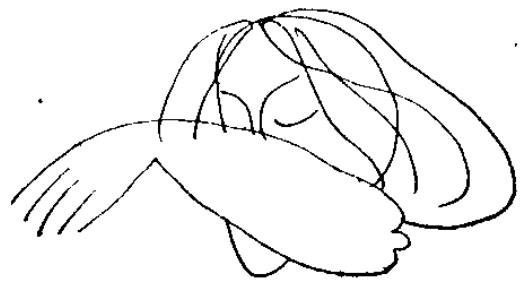

গৌরী ও পার্থ ঘোষকে

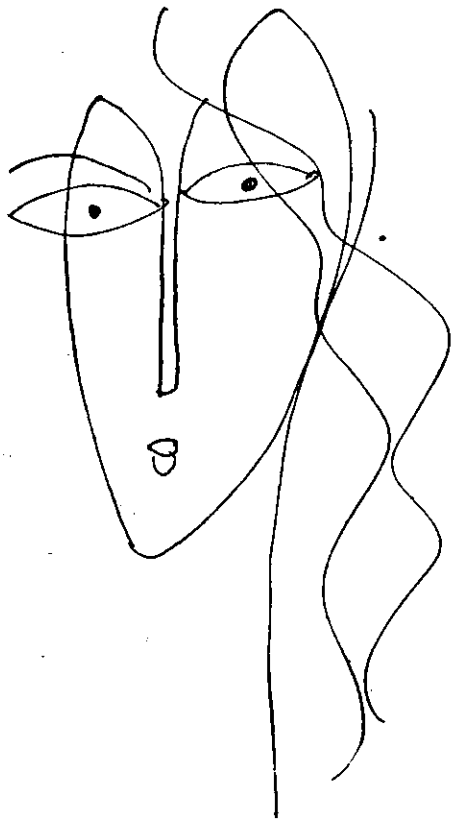

কথোপকথন ১

তোমার পৌঁছতে এত দেরি হল?
পথে ভিড় ছিল?
আমারও পৌঁছতে একটু দেরি হল
সব পথই ফাটা।
পথে এত ভিড় ছিল কেন?
শবযাত্রা? কার মৃত্যু হল?
আমাদের চেনা কেউ না তো?
এই তো সেদিন যোগো গেল
দৌড়ে গেল, এখনও ফিরল না।
আগে পরে শঙ্কর, বিমল।
আমাদের যাকে যাকে প্রয়োজন তারাই পালায়
দূরের সমুদ্রে চলে যায়
কালো নুলিয়ারা যায় যে-রকম বিলীনের দিকে।
আরও যাবে, আমরাও যাবো।
লোক্যাল ট্রেনের মতো বেশ ঘন ঘন
আসছে যাচ্ছে মৃত্যু আজকাল।
তোমার কেমন মৃত্যু ভাল লাগে?
আমি? সেরিব্রাল?
মৃত্যুর কথায় রাগ হল?
মৃত্যুর প্রসঙ্গ তবে থাক
জীবনের আলোচনা হোক।

তোমার চিবুকে এত ছায়া কেন?
অন্ধকারে ছিলে?
আমার কপালে এত ঘাম কেন?
রোদ্দুরে ছিলাম।
তুমি আজ টিপ পরনি তো?
আমি আজ পাঞ্জাবি পরিনি।
তোমার খোঁপার চুল ভাঙা কেন?
ঝড়ে পড়েছিলে?
আমার চুলের ফাঁকে রক্ত কেন?
বাজ পড়েছিল।

আজকাল রোজই ঝড় ওঠে।
গাছ পড়ে, ল্যাম্পপোস্ট পড়ে
মানুষও পাখির মত ছিঁড়ে-খুঁড়ে
খানাখন্দে পড়ে।
ঝড় যেন তুফান এক্সপ্রেস
হাউ-মাঁউ হাঁউ-মাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ...
ঝড়ের কথায় রাগ হল?
ঝড়ের প্রসংগ তবে থাক।
জীবনের আলোচনা হোক।

তোমার চোখের মণি লাল কেন?
বৃষ্টিতে ভিজেছো?
আমার হাতের শিরা নীল কেন?
আগুনে পুড়েছে।
বলেছিলে আজ চিঠি দেবে,
এনেছো? বাঃ, মেনি মেনি থ্যাংকস।
একি দিলে? এ তো শুধু খাম!
খাম থেকে চিঠি কোথা গেল?
ঝড়ে উড়ে গেছে?
আমারও চিঠির সব লেখা
জলে ধুয়ে গেছে।
আজকাল জলও শিখে গেছে
নানান ছলনা।
জল কারো শাড়িকে ভেজায়
জল কারো ঘরবাড়ি কাড়ে
দরজায় ব্যস্ত কড়া নাড়ে।
একবার আমাদের ঘরছাড়া করেছিল জল
বালিশ, তোশক, খাট, ঘটি-বাটি থালা
সবকিছু হাঙরের হাঁ-এ গিলে খেলো।
পচা-জলে আমরা যেন শ্যাওলার, কচুরিপানার
নিকট আত্মীয় হয়ে...
জলের কথায় রাগ হল?
জলের প্রসংগ তবে থাক।
জীবনের আলোচনা হোক।

কাল তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে?
মিশর? মিশরে গিয়েছিলে?
কী আশ্চর্য! আমিও তো কাল
স্বপ্নে ঐ মিশরে ছিলাম।
সারি সারি মমির কঙ্কাল।
হীরের চোখের মতো চোখ
মুক্তোর দাঁতের মতো দাঁত
প্রাণ ছাড়া বাকি সব প্রাণের আরাম।
নক্ষত্রদীপ্তিতে ফুটে আছে।
এদের কি আর মৃত্যু হবে?
তুমি প্রশ্ন জানালে আমাকে।
এরা তো মৃত্যুরই স্কাল্পচার
আমি জানালাম।
তোমার দুচোখ নদী হলো
তোমার চিবুকে জ্যোৎস্না এলো।
তুমি যেন সুখে নীল অন্তরীক্ষ হলে।
তুমি বললে, আমি মমি হবো।
তুমি মৃত হতে হতে
তুমি ধ্বংস হতে হতে
তুমি মমি হতে হতে
মমির কথায় রাগ হলো?
মমির প্রসঙ্গ তবে থাক।
জীবনের আলোচনা হোক।

কথোপকথন ২

কী হয়েছে? কপালে ভাঁজ কেন?
চোর-ডাকাতি? আমাকে খুলে বলো
সকালবেলার শ্বেতপদ্মের রোদে
সন্ধেবেলার বিষাদ সেজে আছো।

কী হয়েছে আমাকে খুলে বলো
হারিয়ে গেছে পায়ের তোড়া মল?
ঠিকানা-লেখা খুঁচরো ছেঁড়া পাতা?
গোপন চিঠি? গলার রত্নহার?

কী বললে? এক বৃষ্টিপাগল দিনের
মৌ-মাখানো স্মৃতির গন্ধ? সেকি?
সেতো তুমি নিজের বুকের থেকে
উপড়ে করে দিয়েছ করতলে।
রেখেছি বুকে, বুকের বন্ধ ঘরে
অবশ্য রোজ সন্ধ্যা-প্রদীপ দি।

কথোপকথন ৩

তোমার বন্ধু কে? দীর্ঘশ্বাস?
আমারও তাই।
আমার শূন্যতা গণনাহীন।
তোমারও তাই?

দূরের পথ দিয়ে ঋতুরা যায়
ডাকলে দরোজায় আসে না কেউ।
অযথা বাঁশি শুনে বাইরে যাই
বাতাসে হাসহাসি বিদ্রূপের।

তোমার সাজি ছিল, বাগান নেই
আমারও তাই।
আমার নদী ছিল, নৌকো নেই
তোমারও তাই?

তোমার বিছানায় বৃষ্টিপাত
আমার ঘরেদোরে ধুলোর ঝড়।
তোমার ঘরেদোরে আমার মেঘ
আমার বিছানায় তোমার হিম।

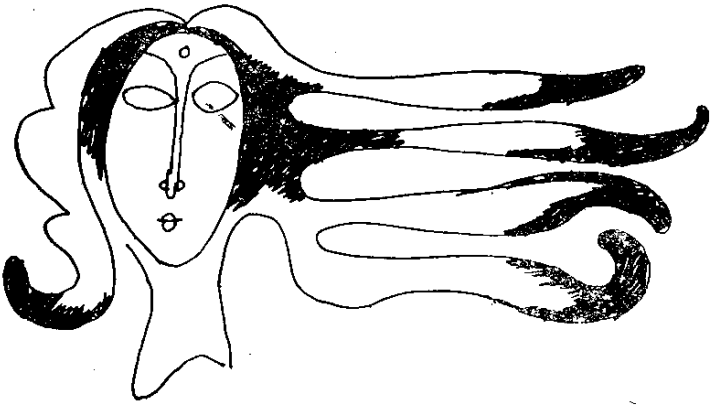

—যে কোন একটা ফুলের নাম বল
—দুঃখ।
—যে কোন একটা নদীর নাম বল।
—বেদনা।
—যে কোন একটা গাছের নাম বল
—দীর্ঘশ্বাস।
—যে কোন একটা নক্ষত্রের নাম বল
—অশ্রু।
—এবার আমি তোমার ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি
—বলো।
—খুব সুখী হবে জীবনে।
শ্বেতপাথরে পা।
সোনার পালঙ্কে গা।
এগোতে সাতমহল
পিছোতে সাতমহল।
ঝর্নার জলে স্নান
ফোয়ারার জলে কুলকুচি।
তুমি বলবে, সাজবো।
বাগানে মালিনীরা গাঁথবে মালা
ঘরে দাসীরা বাটবে চন্দন।
তুমি বললে, ঘুমবো।
অমনি গাছে গাছে পাখোয়াজ তানপুরা,
অমনি জ্যোৎস্নার ভিতরে এক লক্ষ নর্তকী।
সুখের নাগরদোলায় এইভাবে অনেকদিন।
তারপর
বুকের ডান পাঁজরে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে
রক্তের রাঙা মাটির পথে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে
একটা সাপ
গায়ে বালুচরীর নক্সা
নদীর বুকে ঝুঁকে-পড়া লাল গোধূলি তার চোখ
বিয়েবাড়ির ব্যাকুল নহবত তার হাসি,
দাঁতে মুক্তোর দানার মত বিষ,
পাকে পাকে জড়িয়ে ধরবে তোমাকে

যেন বটের শিকড়
মাটিকে ভেদ করে যার আলিঙ্গন।
ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত হাসির রঙ হলুদ
ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত সোনার গয়নায় শ্যাওলা
ধীরে ধীরে তোমার মখমল বিছানা
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে সাদা।
—সেই সাপটা বুঝি তুমি?
—না।
—তবে?
—স্মৃতি।
বাসরঘরে ঢোকার সময় যাকে ফেলে এসেছিলে
পোড়া ধূপের পাশে।

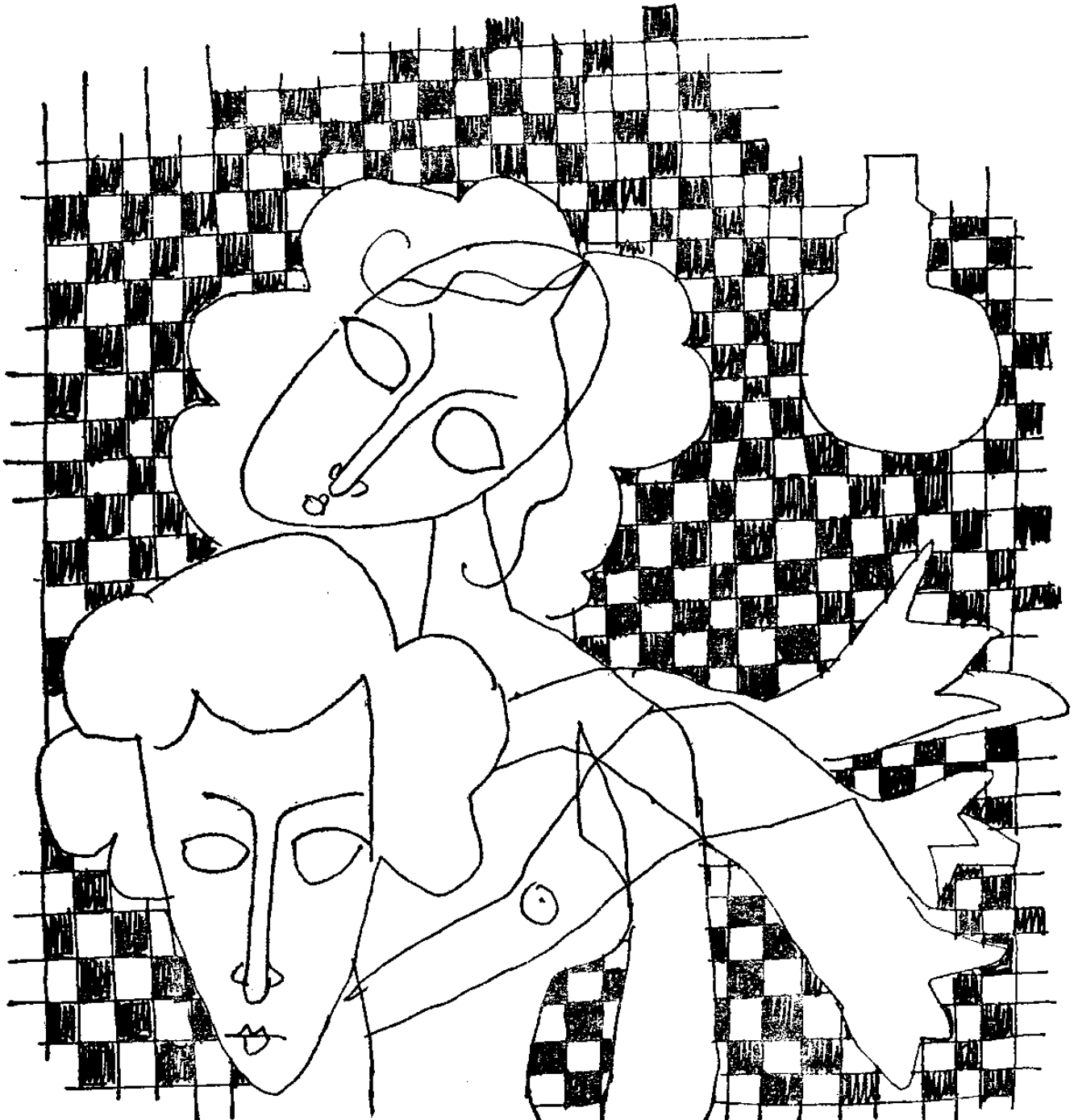

কথোপকথন ৭

তোমার চিঠি আজ বিকেলের চারটে নাগাদ
পেলাম।
দেরি হলেও জবাব দিলে, সপ্তকোটি
সেলাম।
আমার জন্যে কান্নাকাটি? মনকে পাথর
বানাও।
চারুলতা আসছে আবার। দেখবে কিনা
জানাও।
কখন কোথায় দেখা হচ্ছে লেখোনি এক
ফোঁটাও।
পিঠে পরীর ডানা দিলে, এবার হাওয়ায়
ছোটাও।
আসবে কি সেই রেস্টুরেন্টে, সীতাংশু যার
মালিক?
রুপোলী ধান খুঁটবে বলে ছটফটাচ্ছে
শালিক।

কথোপকথন ৮

—উত্তরোত্তর অত্যন্ত বাজে হয়ে উঠছো তুমি।
আজ থেকে তোমাকে ডাকবো
চুল্লী।
কেন জান? কেবল পোড়াচ্ছ বলে।
সুখের জন্যে হাত পাতলে যা দাও
সে তো আগুনই।

—উত্তরোত্তর অত্যন্ত যা-তা হয়ে উঠছো তুমি।
আজ থেকে আমিও তোমাকে ডাকবো
জল্লাদ।
কেন জান? কেবল হত্যা করছো বলে।
তোমাকে যা দিতে পারি না, তার দুঃখ
সে তো ছুরিরই ফলা।

কথোপকথন ৯

আজ তোমাকে অনেক নামে ডাকতে ইচ্ছে করছে।
ডাকবো?
আজকে তুমি প্রথম শ্রাবণ, সঙ্গে চাঁপার গন্ধ
মাখবো?

গভীরতর গানের ভিতর খেয়া দেওয়ার নৌকো
চলছে।
একটু আগে হাসলে যেন আকাশ সোনার আংটি
গলছে।

এখন তোমায় 'কুরুস কাঠি' এই নামেতে ডাকবো
শুনছো?
ছিলাম সুতো, তাকে হাজার চৌকো ও গোল নকশায়
বুনছো।

কথোপকথন ১০

—কাল বাড়ি ফিরে কী করলে?
—কাঁদলাম। তুমি?
—লিখলাম।
—কবিতা? কই দেখাও।
—লিখেই কুচিকুচি।
—কেন?
—আমার আনন্দের ভিতরে অনর্গল কথা বলছিল আর্তনাদ
আর্তনাদের ভিতরে গুনগুন গলা ভাঁজছিল অদ্ভুত এক শান্তি
আর শান্তির ভিতরে সমুদ্রের সাঁই সাঁই ঝড়।
যে-সব অক্ষর লিখলেই লাল হওয়ার কথা
তারা হয়ে যাচ্ছিল সাদা।
যে সব শব্দ সাদা কাশবন হয়ে দুলবে
তাদের মনে হচ্ছিল শুকনো ঝাউপাতার ওড়াউড়ি।
বুঝলাম সে ভাষা আমার জানা নেই
যার আয়নায় নিজের মুখ দেখবে ভালবাসা।
—তাই বলে ছিঁড়ে ফেললে?
—বাতাস থেকে একটা অট্টহাসি লাফিয়ে উঠে বললে
পিদিমের সলতে হয়ে আরো কিছু দিন পুড়ে থাক হ।
পুড়ে থাক হ।

—তুমি আজকাল বড় সিগারেট খাচ্ছ শুভংকর।
—এখুনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।
কিন্তু তার বদলে?
—বড্ড হ্যাংলা। যেন খাওনি কখনো?
—খেয়েছি।
কিন্তু আমার খিদের কাছে সেসব নস্যি।
এই কলকাতাকে এক খাবলায় চিবিয়ে খেতে পারি আমি।
আকাশটাকে ওমলেটের মতো চিরে চিরে
নক্ষত্রগুলোকে চিনেবাদামের মতো টুকটাক করে
পাহাড়গুলোকে পাঁপর ভাজার মতো মড়মড়িয়ে
আর গঙ্গা?
সে তো এক গ্লাস সরবত।
—থাক। খুব বীরপুরুষ।
—সত্যি তাই।
পৃথিবীর কাছে আমি এই রকমই ভয়ংকর বিস্ফোরণ।
কেবল তোমার কাছে এলেই দুধের বালক
কেবল তোমার কাছে এলেই ফুটপাতের নুলো ভিখারী
এক পয়সা, আধ পয়সা কিংবা এক টুকরো পাউরুটির বেশী
আর কিছু ছিনিয়ে নিতে পারি না।
—মিথ্যুক।
—কেন?
—সেদিন আমার সর্বাঙ্গের শাড়ি ধরে টান মারনি?
—হতে পারে।
ভিখারীদের কি ডাকাত হতে ইচ্ছে করবে না একদিনও?

কথোপকথন ১২

—কাল বিকেলে
তোমার ঘাড়ে চিবুক রেখে প্রকাণ্ড বাঘ কী খুঁজছিল
দেখতে পেলে?
—জানি জানি,
খুঁজছিল তার সুখের নদীর উৎস এবং পারাপারের
শেষ পারানি।
—সমস্ত রাত
নিজের বুকের পাথর খুঁড়ে বইয়েছে কাল ক্ষতিকারক
জলপ্রপাত।
—লক্ষ্মী সোনা,
আমি তোমার রৌদ্রছায়ায় সর্বক্ষণই সংগে হাঁটি
সমুদ্রতীর কষ্ট দিলে বিছোই বালির শীতলপাটি
বুকের কাছে নেই তবুও তোমার বুকেই বসতবাটি
ভুল কোরো না।

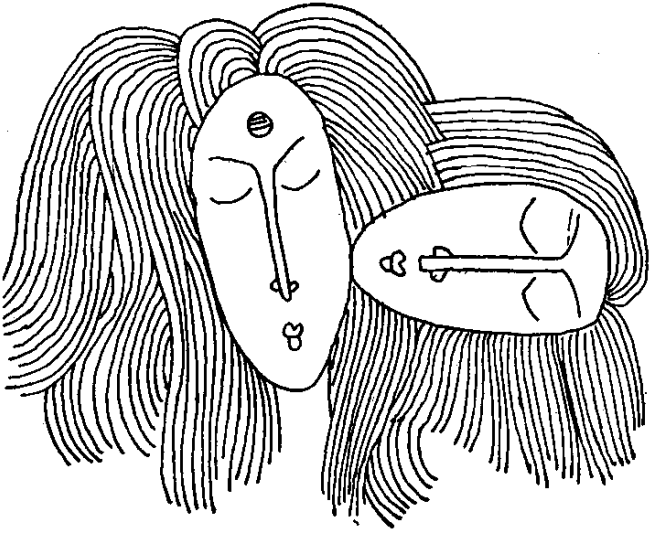

জানলার গায়ে মেঘ, মেঘের গায়ে ফুরফুরে আদ্দির পাঞ্জাবি
পাঞ্জাবির গায়ে লক্ষ্ণৌ-ই চিকনের কাজ
হাসছো কেন? বলো হাসছ কেন?
—মেঘ রোজ রোজ পাঞ্জাবি পরবে কেন?
এক একদিন পরবে বালুচর শাড়ি কিংবা
খাটাও-এর পাতলা প্রিন্ট
মাথায় বাগান-খোঁপা, খোঁপায় হীরের প্রজাপতি
—আচ্ছা তাই হবে।
মেঘ সাজবে জরি-পাড় শাড়িতে
আর তখুনি নহবতখানার সানাই-এ জয়জয়ন্তী
আর তখুনি অরণ্যের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বুনো জানোয়ারের হাঁক-ডাক
খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে জেগে উঠবে জলপ্রপাত
শিকারের জন্যে তীর ধনুক, দামামা দুন্দুভি
হাসছো কেন? বলো হাসছো কেন?
—তুমি এমনভাবে বলছ
যেন ভালোবাসা মানে সাপে আর নেউলে ভয়াবহ একটা যুদ্ধ।
ভয় লাগছে।
অন্য গল্প বলো।

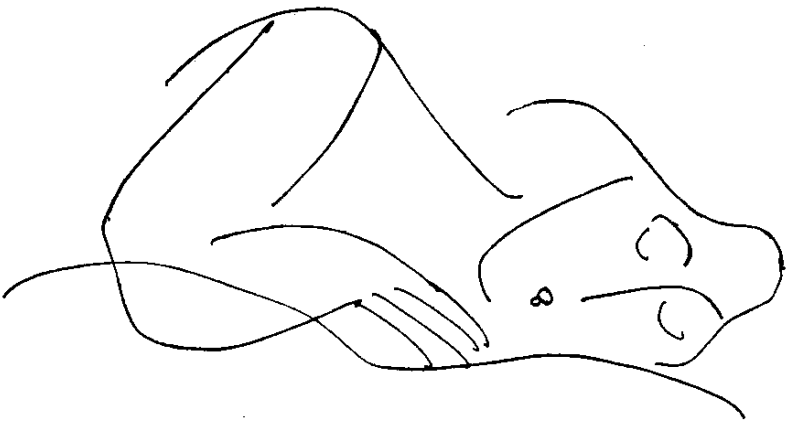

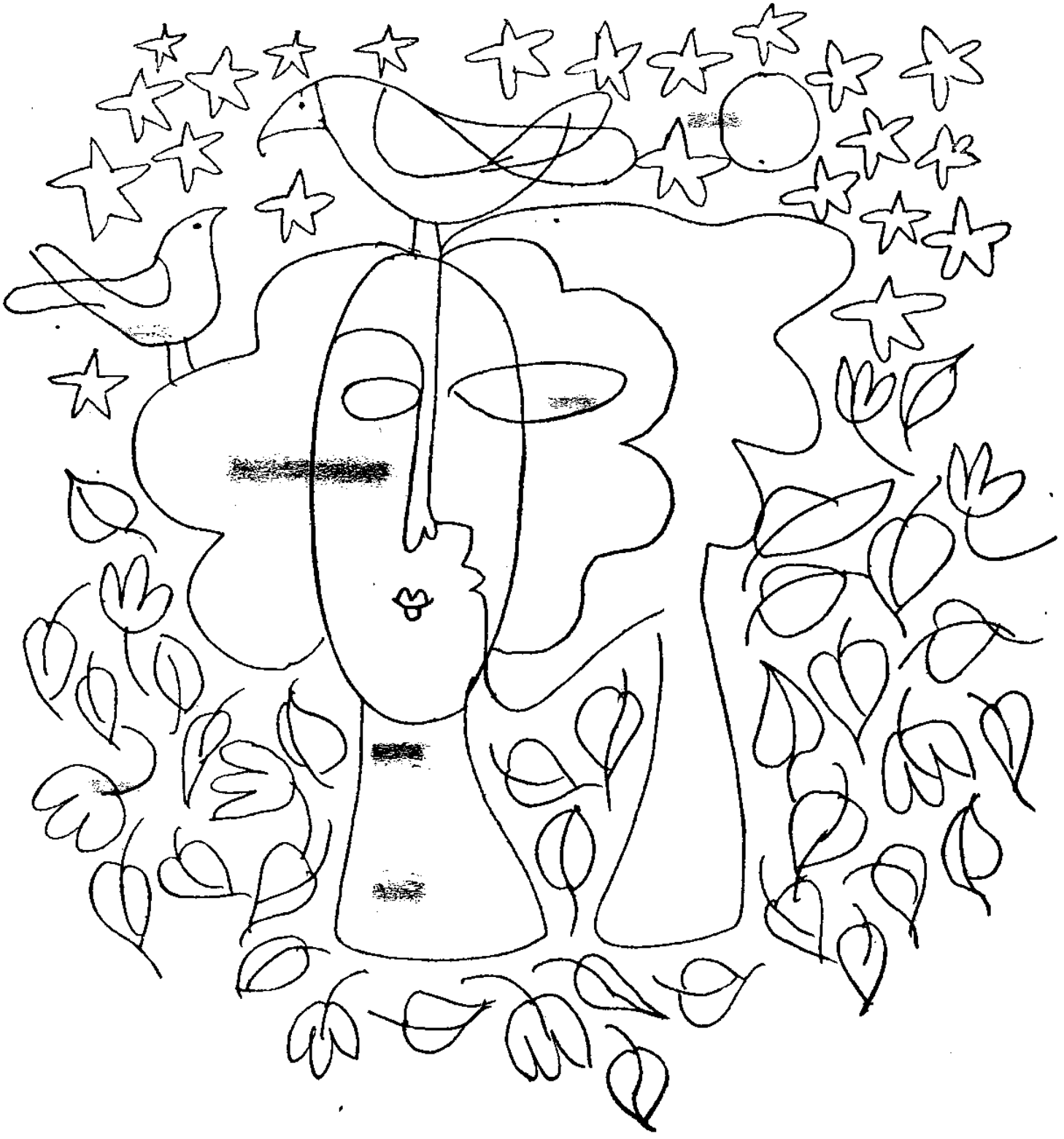

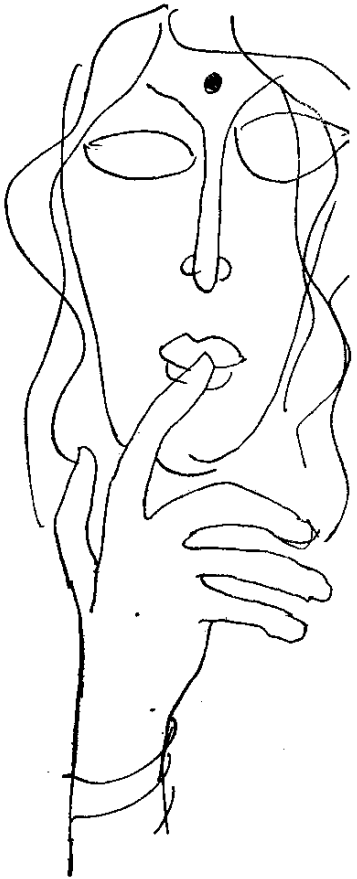

কথোপকথন ১৪

—দেখ, অনন্তকাল ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো আমরা কথা বলছি
অথচ কোন কথাই শেষ হল না এখনও।
একটা লাল গোলাপের কান্নার গপ্পো শোনাবে বলেছিলে
কবে বলবে?
—চলো উঠি। বড্ড গরম এখানে।
—দেখ, অনন্তকাল শুকনো বাঁশপাতার মতো আমরা ঘুরছি
অথচ কেউ কাউকে ছুঁতে পারলুম না এখনো।
একটা কালো হরিণকে কোজাগরী উপহার দেওয়ার কথা ছিল
কবে দেবে?
—চলো উঠি। বড্ড ঝড়-ঝাপটা এখানে।

কথোপকথন ১৫

তরমুজের বাইরেটা সবুজ
ভিতরটা লাল।
আচ্ছা বলতো, কেন মনে পড়ল কথাটা?
পারলে না?
তোমার সবুজ শাড়িটার দিকে তাকিয়ে।

ওগো সুন্দরী! মনে আছে কাল তেসরা জুন?
সেকি! ভুলে গেছো? তুমি তো দেখছি সাংঘাতিক!
ভুলে গেলে তিথি প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর?
আজ্ঞে না এটা ঠাট্টা নয় বা ইয়ার্কি।
ফিচেল হাওয়ারা যেভাবে সজনে গাছের চুল
চুলের বিনুনি ঘেঁটে দিয়ে করে মশকরা
তুমি কি ভাবছো এটাও তেমনি খেলাচ্ছল?

তুমি যা বলছো স্বীকার করছি। ইয়েস স্যার!
বিয়ে আমাদের হয়নি এবং হবেও না।
তাতে কী হয়েছে? মনে মনে তুমি পার্বতী
তেসরা জুনের বিকেল থেকেই। সেটা তো ঠিক?
তেসরা জুনেই প্রথম উঠল ঘূর্ণিঝড়
তেসরা জুনেই প্রথম প্রবল বৃষ্টিপাত
আকাশে আতর ছুঁড়ল প্রথম কদম ফুল।
একটি রুমালে তোমার হাত ও আমার হাত।

আমরা নিকটবর্তী হলাম তেসরা জুন
তোমার রথের চাকায় ভাঙল হাড়-পাঁজর
দেয়াল-দালান দরজা-বিছানা পত্তরে
তোমার হাসির বিদ্যুৎরেখা দিল আগুন
আমরা পরস্পরের হলাম তেসরা জুন।

তেসরা জুনেই আমার আকাশে তোমার চাঁদ
তোমার হাওয়ায় আমি উড়ো চুল তেসরা জুন।

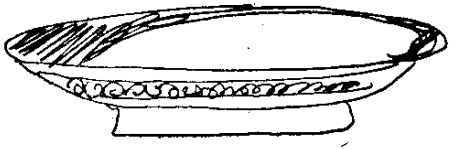

কথোপকথন ১৭

—নন্দিনী, তুমি একটুখানি তো জল
অথচ ভাসাও স্রোতের কলস্বরে।
—তুমিও তো মিহি বাতাস, শুভংকর
অথচ কী করে কাঁপাও সুখের ঝড়ে?

কথোপকথন ১৮

হ্যালো, হ্যালো, কখন আসছ তুমি?
কোথায় মেঘ? কোথাও মেঘ নেই।
হ্যালো, হ্যালো, বৃষ্টি যদি নামে?
ভিজবে, হ্যালো, ভিজবো, অনায়াসে
গাছপালারা যেমন করে ভেজে
ভিজলে তৃণ রাজার ছেলে হয়
হ্যালো, হ্যালো, বলছি ভিজবো জলে
ভেজা মাটির গন্ধ হবে তুমি
আমি তাতে ছড়াবো ডালপালা।
শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো হ্যালো হ্যালো
বেরিয়ে পড়, আকাশে রামধনু
উঠবে, হ্যালো, উঠবে এবার রোদ
রোদের হাতে বর্শা, হ্যালো হ্যালো
তোমার পায়ের ঘুঙুর শুনতে পেলে
সমস্ত মেঘ, আঁধার খসে হ্যালো
সমস্ত মেঘ আঁধার, হ্যালো হ্যালো
সমস্ত মেঘ, হ্যালো, হ্যালো হ্যালো।

কথোপকথন ১৯

একটা মজার গল্প তোমায় বলতে ভুলে গেছি।
সেদিন ছিল বেস্পতিবার। আকাশ ছুঁড়ে মারল ঘূর্ণিঝড়
অমিতাভর সঙ্গে হঠাৎ কলেজ স্ট্রীটে দেখা হতেই, এই যে শুভঙ্কর
কেমন আছিস, এটা-ওটা দু-দশ কথার পর
আসল প্রশ্ন, এখনো সেই নন্দিনীতেই ডুবে আছিস নাকি?
ইদানীং যা লেখা-টেখা বেরোচ্ছে তা পড়লে মনে হয়
নন্দিনী তোর আকাশ এবং তুই উড়ন্ত পাখি।
অমিতাভ, তুমি জানই, পলিটিক্‌সে নিবেদিত প্রাণ
তাই তাকে বললাম
নন্দিনীকে ধরিস যদি প্রকান্ড বিপ্লব
আমি হলাম তার ভিতরের দাবি-দাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্লোগান।

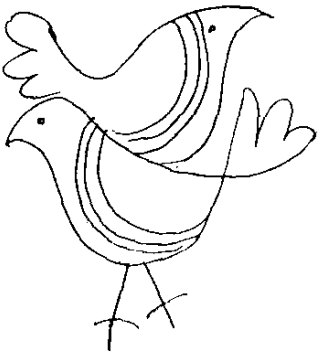

কথোপকথন ২০

—ইলাসট্রেটেড উইক্‌লিতে তোমার তিনটে কবিতা ছাপা হল
আমায় কিন্তু বলনি।
মধুমিতার সঙ্গে দেখা এলিয়াসে, সেই আমাকে বলল।
শুনে এমন রাগ হল যে ভেবেছিলাম বন্ধ করব দেখা।
তুমি কোথায় কী লিখছো তা শুনতে হবে হাটের লোকের মুখে?
সেই রাগেতেই চিঠির জবাব লিখেও তাকে কবর দিয়ে এলাম
লেপ-তোশকের নীচে।
—উপরে কাঁটা, নীচে কাঁটা, উঠতে-বসতে লাথি-ঝাঁটা
এমনি আমার ভাগ্য।
তোমার কাছেই পেয়েছিলাম শুকনো পাতায় প্রথম বৃষ্টিজল
তুমিই প্রথম শুনিয়েছিলে সেই বাঁশি যা ক্ষতের মুখে মলম।
তেমনি আজও তোমার মুখেই শুনছি প্রথম ইলাসট্রেটেড উইক্‌লিটার কথা,
এ পর্যন্ত চোখের দেখাও দেখিনি।
রাগের মেঘটা সরিয়ে দিয়ে এবার একটু প্রসন্ন মুখ তুলুন।

—তোমাদের ওখানে এখন লোডশেডিং কী রকম?
—বোলো না। দিন নেই, রাত নেই, জ্বালিয়ে মারছে।
—তুমি তখন কী করো?
—দরজা খুলে দিই।
জানলা খুলে দিই।
পর্দা খুলে দিই।
আজকাল হাওয়াও হয়েছে তেমনি ফন্দিবাজ।
যেমনি অন্ধকার, অমনি মানুষের ত্রিসীমানা ছেড়ে দৌড়।
—তুমি তখন কী করো?
—গায়ে জামা-কাপড় রাখতে পারি না।
সব খুলে দিই,
চোখের চশমা, চুলের বিনুনি, বুকের আঁচল, লাজ-লজ্জা সব।
—টাকা থাকলে তোমার নামে নতুন ঘাট বাঁধিয়ে দিতুম কাশী মিত্তিরে
এমন তোমার উথাল-পাতাল দয়া।
তুমি অন্ধকারকে সর্বস্ব, সব অগ্নিস্ফুলিংগ খুলে দিতে পার কত সহজে।
আর শুভংকর মেঘের মত একটু ঝুঁকলেই
কী হচ্ছে কি?
শুভংকর তার খিদে-তেষ্টার ডালপালা নাড়লেই
কী হচ্ছে কি?
শুভংকর রোদে-পোড়া হরিণের জিভ নাড়ালেই
কী হচ্ছে কি?
পরের জন্মে দশদিগন্তের অন্ধকার হবো আমি।

কথোপকথন ২২

তেরোই জুলাই কথা দিয়েছিলে আসবে।
সেইমত আমি সাজিয়েছিলাম আকাশে
ব্যস্ত আলোর অজস্র নীল জোনাকি।
সেই মত আমি জানিয়েছিলাম নদীকে
প্রস্তুত থেকো, জলে যেন ছায়া না পড়ে
মেঘ বা গাছের। তেরোই জুলাই এলে না।
জ্বর হয়েছিল? বাড়িতে তো ছিল টেলিফোন।
জানালে পারতে। থার্মোমিটার সাজতাম।
নীলিমাকে ছুঁয়ে পাখি হতো পরিতৃপ্ত।

কথোপকথন ২৩

নন্দিনী— কাল তোমাকে ভেবেছি বহুবার
কালকে ছিল আমার জন্মদিন।
পরেছিলাম তোমারই দেওয়া হার।

শুভঙ্কর— আমার হার কি আমার চেয়েও বড়?
বালিকে তুমি বিলোলে আলিঙ্গন
সমুদ্রকে দিলে না কুটো খড়ও।

নন্দিনী— আমার কী দোষ? ডেকেছি বহুবার
কিন্তু তোমার এমন টেলিফোন
ঘাটের মড়া, নেইকো কোনো সাড়।

শুভঙ্কর— বাতাস ছিল, বাতাসে ছিল পাখি
আকাশ ছিল, আকাশে ছিল চাঁদ
তাদের বললে, খবর দিত নাকি?

নন্দিনী— আজ্ঞে মশাই, বলেছিলাম তাও।
তারা বললে, ধুঁকছি লোডশেডিং-এ,
নড়তে-চড়তে পারবো না এক পাও।

কথোপকথন ২৪

—তোমাকে আজকাল এত রোগা লাগে কেন শুভংকর?
খুব ম্রিয়মাণ লাগে
যেন ঘন বর্ষাকাল, মেঘের ধূসর ডানা, জল-কোলাহল
ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলেছে তোমাকে।
ভাঙা কোনো মন্দিরের পুরনো গন্ধের মতো লাগে।
অতীতকালের কোনো স্তম্ভে আঁটা শ্যাওলার মতো
অতীতে সবুজ ছিলে, এখন শোকের মতো হীন।
তোমাকে কি ঘিরে আছে কোনো কারাগার?
গরাদের কালো হাত, ঘন বৃক্ষজাল?
অথবা তুমি কি কিছু হারিয়েছ, অত্যন্ত আপন কোনো কিছু?
সন্ধ্যাতারা ডুবে গেলে কোনো কোনো পাখি শুধু কাঁদে।
তোমার সোনার আংটি জলের গহ্বরে ভেসে গেছে?
তোমার গায়ের সেই চাঁপা-রঙ, চমৎকার শোভন প্রচ্ছদ
শুভংকর, কোথায় হারালে?

—নন্দিনী, তুমি তো জান আমার বাগান-পাট নেই।
যেটুকু বাগান ছিল, শৈশবের সংগে ঝরে গেছে।
তুমি ফুল ভালোবাসো বলে
তোমাকে ফুলের বৃন্তে মাংগলিক উৎসবের মতো লাগে বলে
আমাকে ফুলের খোঁজে যেতে হয় পথ খুঁজে খুঁজে
সিন্ধুনদ, হিন্দুকুশ, হরপ্পার মত দূরান্তরে।
সেই সব পথে বহু ভাঙাচোরা বিমানবন্দর
বহু যুদ্ধ জাহাজের হাড়-গোড়, মেশিনগানের
কংকাল-কবর, রূঢ় কলকব্জা-কাঠ-কয়লা-খড়।
সেই সব পথে বহু পতাকার সার কিন্তু প্রাণচিহ্ন নেই।
দুরারোগ্য অসুখের শ্বাসকষ্টে বিদীর্ণ বাতাস
এবং পাথরও খুব, বড় বড় ডাকাতের মতন পাথর।
যেতে যেতে রক্তপাত হয়।
যেতে যেতে সর্বাঙ্গের উদ্যমে ও অভিলাষে, বাসনায়, বাহুতে, বল্কলে
নীল মরচে পড়ে।

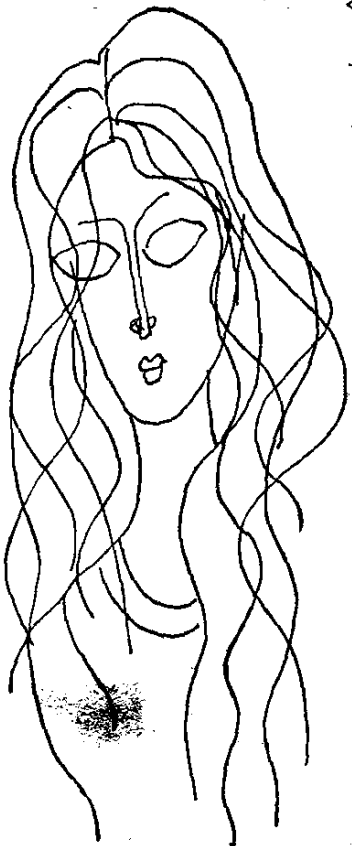

—হাত-ঘড়িটা কি ছোঁ মেরেছে গাংচিলে?
শকুন্তলার আংটির মত গিলেছে কি কোনো রাখব বোয়াল-টোয়াল?
—কেন?
—আসবার কথা কখন, এখন এলে?
বসে আছি যেন যুগযুগান্ত, ভাঙা মন্দিরে উপুড় শালগ্রাম।
চা খেলাম, খেয়ে সিগারেট, খেয়ে আবার—বেয়ারা, কফি!
আর ঘড়ি দেখা, এবং যে-কোনো জুতোর শব্দে চমকে চমকে ওঠা।
মনে হচ্ছিল অনন্তকাল প্রতীক্ষাটারও অন্য নামটা প্রেম।
—স্যরি, সত্যিই! কী করবো বল রাস্তায় যেন মাছি-থকথকে ভিড়
তারপরে লাল মিছিলে মিছিলে লরীতে লরীতে সব রাস্তাই বন্ধ্
তারপরে এই লু-হাঁকানো রোদ, কী যে বিচ্ছিরী! জ্বলে-পুড়ে সব খাক্,
আকাশটার কি ব্যামো হল কিছু? আষাঢ় মাসেও মেঘের কলসী ফাঁকা।
মনে হচ্ছিল শতাব্দী কেটে যাবে
তবু কোনদিন লেনিন সরণি পারবে না যেতে শেক্সপীয়রের কাছে।
তারপরে জানো, কাল সারারাত ঘুমোইনি, শুধু কেঁদে
কাঁদবো যে তারও সুখ কি কপালে আছে?
পাশে বোন শোয়, পিসীমা খাটের নীচে।
—হঠাৎ কান্না কেন?
—তোমার একটা চিঠি সামহাউ পড়েছে বাবার হাতে।
বাবা গম্ভীর। তার মানে আজ কাল বা পরশু ঘটবে বিস্ফোরণ।
তার মানে আজ কাল বা পরশু আমি হয়ে যাবো পঞ্চবটীর সীতা
পুরে দেওয়া হবে বিধিনিষেধের গোল গণ্ডীর ভিতরে হ্যাঁচকা টানে।
—যা অনিবার্য, দ্রুত ঘটে যাওয়া ভালো।
আজ সকালের কাগজেই লেখা আছে
ঘন্টায় আশী মাইল দৌড়ে আসছে বৃষ্টি-ঝড়।
বুঝেছি অতঃপর
পরিতে হইবে সারা গায়ে রণসাজ।
মনে পড়ে? আমি ভিক্টোরিয়ার মাঠে একদিন শীতের সন্ধ্যেবেলায়
তোমার শরীর-ভর্তি আগুনে সেঁক-তাপ নিতে নিতে
বলিয়াছিলাম, নন্দিনী! মনে রেখো
ভালবাসা মানে আমরণ এক রক্ত রণাঙ্গন।

কথোপকথন ২৬

—আমার চিঠিটার জবাব কই?
যদি না এনে থাকো তাহলে আজ
তুলবো দুই হাতে এমন ঝড়
বসন উড়ে যাবে চণ্ডীগড়
খোঁপার খিল খুলে বন্দী চুল
হানবে চোখে মুখে আক্রমণ।
কেউটে সাপ হবো। সাত পাকে
নগ্ন দৃশ্যের চূড়া ও তল
জড়াবে, **এমনই** সে আলিঙ্গন
ভাঙবে হাড়-গোড়। আমার কি?

—এমন ছটফটে ধৈর্যহীন
মানুষ কোনদিন দেখিনি আর।
শুনেছি আজকাল বোদলেয়ার
র‍্যাঁবো ও ভের্লেন পড়ছো খুব।
এখন সেই সব আগুন-তাপ
আমারই ঘাড়ে বুঝি আছড়াবে?
চিঠিটা নাও, নিয়ে শান্ত হও।
আমার হাড়গোড় ভেঙো না আর।
ভাঙলে কার ফুল তুলবো রোজ
শুনি মশাই?

কথোপকথন ২৭

হঠাৎ এলে যে? বেশ তো
ভুলে ছিলে। ভুলে ছিলামও।
গাছে এঁটে ছিল ছায়াময়
স্মৃতির ছাপানো ছবিরা।
রোগা হয়ে গেছ। আমিও?
হতে পারে। বালি ঢুকেছে
জলস্রোতের গভীরে।
বেলা তো বাড়ছে। নীলিমা
নীল হয়ে যাবে ক্রমশ।
কিছু লাল ফুল এখনও
তবুও ফুটছে। জানি না
কে ফোটায়। সে কি তোমারই
চকিত আলোক? অথবা
আমার চৌকো কুঠরীর
গোপন রক্তারক্তি?
দাঁড়িয়ে থাকবে? বোসো না
এই তো মাদুর বিছানো
আমার সর্বশরীরে।

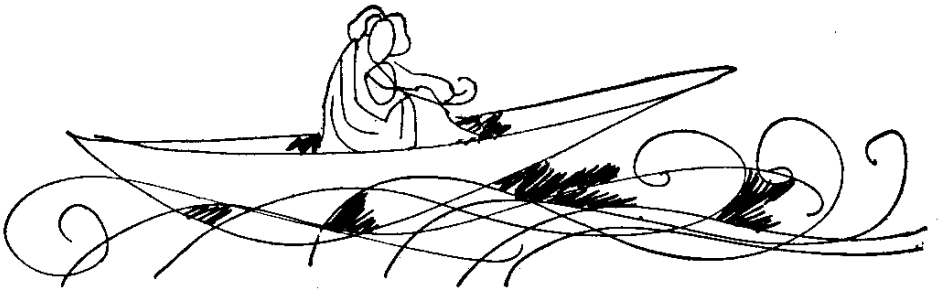

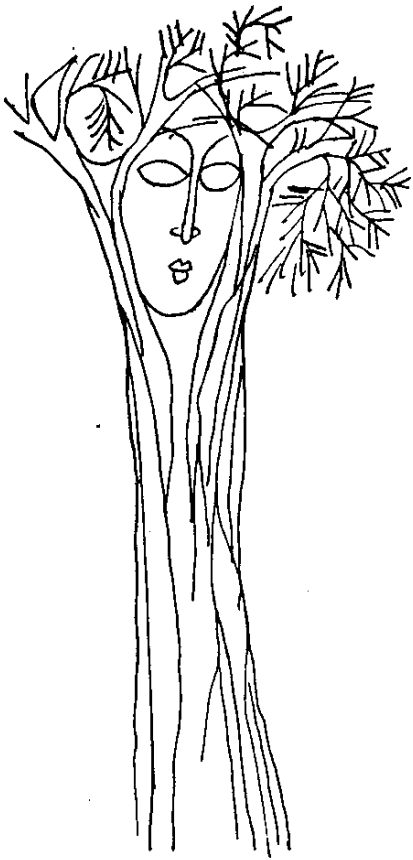

—আমার আগে আর কাউকে ভালবাসনি তুমি?
—কেন বাসব না? অনেক।
বিষবৃক্ষের ভ্রমর
যোগাযোগের কুমু
পুতুলনাচের ইতিকথার কুসুম
অপরাজিত-র
—ইয়ার্কি করো না। সত্যি কথা বলবে।
—রোগা ছিপছিপে যমুনাকে ভালবেসেছিলাম বৃন্দাবনে
পাহাড়ী ফুলটুংরীকে ঘাটশীলায়
দজ্জাল যুবতী তোর্সাকে জলপাইগুড়ির জঙ্গলে
আর সেই বেগমসাহেবা, নীল বোরখায় জরীর কাজ
নাম চিল্কা
—আবার বাজে কথার আড়াল তুলছো?
—বাজে কথা নয়। সত্যিই।
এদের কাছ থেকেই তো ভালবাসতে শেখা।
অনন্ত দুপুর একটা ঘাস ফড়িং-এর পিছনে
এক একটা মাছরাঙার পিছনে গোটা বাল্যকাল
কাপাসতুলো ফুটছে
সেইদিকে তাকিয়ে দুটো তিনটে শীত বসন্ত
এইভাবেই তো শরীরের খাল-নালায়
চুইয়ে চুইয়ে ভালবাসার জল।
এইভাবেই তো হৃদয়বিদারক বোঝাপড়া
কার আদলে কী, আর কোনটা মাংস, কোনটা কস্তুরী গন্ধ।
ছেলেবেলায় ভালবাসা ছিল
একটা জামরুল গাছের সঙ্গে।
সেই থেকে যখনই কারো দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই
জামরুলের নিরপরাধ স্বচ্ছতা ভরাট হয়ে উঠছে
গোলাপী আভার সর্বনাশে,
অকাতর ভালবেসে ফেলি তৎক্ষণাৎ।
সে যদি পাহাড় হয়, পাহাড়
নদী হয় নদী
কাকাতুয়া হলে কাকাতুয়া
নারী হলে, নারী।

কথোপকথন ২৯

—দূরে চলে যাও। তবু ছায়া
আঁকা থাকে মেঘে। যেন ওড়ে
বাতাসের সাদা বারান্দায়
বালুচরী বহু বর্ণময়।
গান শেষ তবু তখনো তার
প্রতিধ্বনিরা দশ দিকে।
যেন শুধু তুমি তোমারই সব
মূর্তিতে ঠাসা মিউজিয়াম
ট্রামলাইনের, ছাইগাদার
গর্তে গভীর কলকাতায়।
কী করে এমন পারো তুমি
নন্দিনী?

—সহজ ম্যাজিক। শিখবে কি?
রুমালটা দাও, ঘন গিঁটে
চোখ দুটো বাঁধি। তারপরে
যাদু কাঠিটাকে ছুঁইয়ে দি,
কাছে এসো।

—অত বোকা নই নন্দিনী!
খানিকটা জানি, পুরুষকে
কী করে বানাও পোষা পাখি।
ঝর্না দেখাবে, কখনো তার
উৎসের চাবি খুলবে না।
বিছানা পাতবে মখমলের
কিন্তু বসতে দেবে চেয়ার।
সাজানো দোকানে থাক্‌কে থাক্‌
উর্বরতার বীজ ও সার
অথচ দুবেলা বন্ধ ঝাঁপ।
জলের যা খেলা, ভাসিয়ে সুখ
গাছ ডুবে গিয়ে মরে মরুক
জলের কী?

—মিথ্যে! মিথ্যে! শুভঙ্কর!
তোমরাই ভুলে গাছকে মেঘ
বানিয়ে চেয়েছো বৃষ্টিজল।
যে-মোমবাতির ক্ষণজীবন
তারই কাছে এসে কেবলি চাও
এমন আলো যা অন্তহীন।
তোমরা বুনছো কল্পনায়
আমরা যা নই তারই ছাঁদে
সোনালী সুতোর লম্বা লেস।

—নন্দিনী! হায় এইটুকু
যথেচ্ছাচার আছে বলেই
এই মরা-হাজা পৃথিবীটার
মৃত্যু চাইনি এখনো কেউ।
নইলে তো কবে কড়িকাঠে
ঝুলিয়ে দিতাম। এবং এর
কৃতিত্বটুকু সবই তোমার।
তুমি মানে নারী, যার ছোঁয়ায়
ঘুঁটে পুড়ে হয় গন্ধ ধূপ।

—চুপ করো তুমি, চুপ করো,
আজকাল বড় বাচালতায়
পেয়েছে তোমাকে।

—এটাও তো মজা। যতক্ষণ
তুমি পাশে থাকো, আমি নদী,
নৌকোর পাল, ঝোড়ো হাওয়া।
তুমি চলে গেলে আমি পাহাড়
তাও নয়, যেন ইঁট বা কাঠ
কাঠের টেবিল, বইয়ের র‍্যাক।
এত বোবা থাকি, লোকে ভাবে
মরে গেছি বুঝি অনেকদিন।
একটু আগে যে বললে না
সোনালী সুতোর লম্বা লেস্‌,
আসলে তখন সেইটাকেই
বুনি, যাতে লোকে দেখতে পায়
যে-যার বুকের সঙ্গোপন
উপনিবেশ।

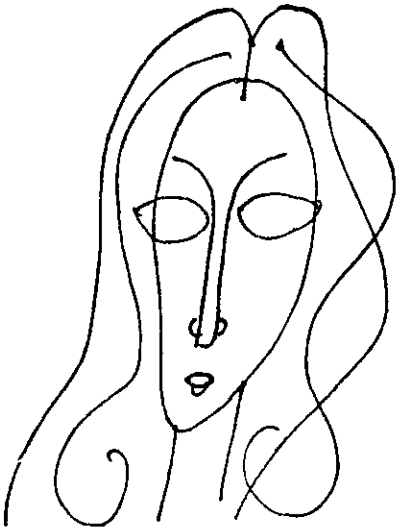

—তুমি আমার সর্বনাশ করেছ শুভংকর।
কিচ্ছু ভাল লাগে না আমার। কিচ্ছু না।
জ্বলন্ত উনোনে ভিজে কয়লার ধোঁয়া আর শ্বাসকষ্ট
ঘিরে ফেলেছে আমার দশদিগন্ত।
এখন বৃষ্টি নামলেই কানে আসে নদীর পাড় ভাঙার অকল্যাণ শব্দ
এখন জ্যোৎস্না ফুটলেই দেখতে পাই
অন্ধকার শ্মশানযাত্রীর মত ছুটে চলেছে মৃতদেহের খোঁজে।
কিচ্ছু ভাল লাগে না আমার। কিচ্ছু না।
আগে আয়নার সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা সাজগোজ
পাউডারে, সাবানে, সেন্টে, সুর্মায়
নিজেকে যেন কেচে ফর্সা করে তোলার মত সুখ।
এখন প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেই
সমস্ত মুখ ভরে যায় গোলমরিচের মত ব্রণে, বিস্বাদে, বিপন্নতায়।
এখন সমস্ত স্বপ্নই যেন বিকট মুখোশের হাসাহাসি
দুঃস্বপ্নকে পার হওয়ার সমস্ত সাঁকো ভেঙে চুরমার।
কিচ্ছু ভালো লাগে না আমার। কিচ্ছু না।

—তুমিও কি আমার সর্বনাশ করনি নন্দিনী?
আগে গোলমরিচের মত এতটুকু ছিলাম আমি।
আমার এক ফোঁটা খাঁচাকে তুমিই করে দিয়েছ লম্বা দালান।
আগাছার জমিতে বুনে দিয়েছ জ্বলন্ত উদ্ভিদের দিকচিহ্নহীন বিছানা।
এখন ঘরে টাঙানোর জন্যে একটা গোটা আকাশ না পেলে
আমার ভাল লাগে না।
এখন হাঁটা-চলার সময় মাথায় রাজছত্র না ধরলে
আমার ভাল লাগে না।
পৃথিবীর মাপের চেয়ে অনেক বড় করে দিয়েছ আমার লাল বেলুন।
গোলমরিচের মত এই একরত্তি পৃথিবীকে।
আর ভাল লাগে না আমার।

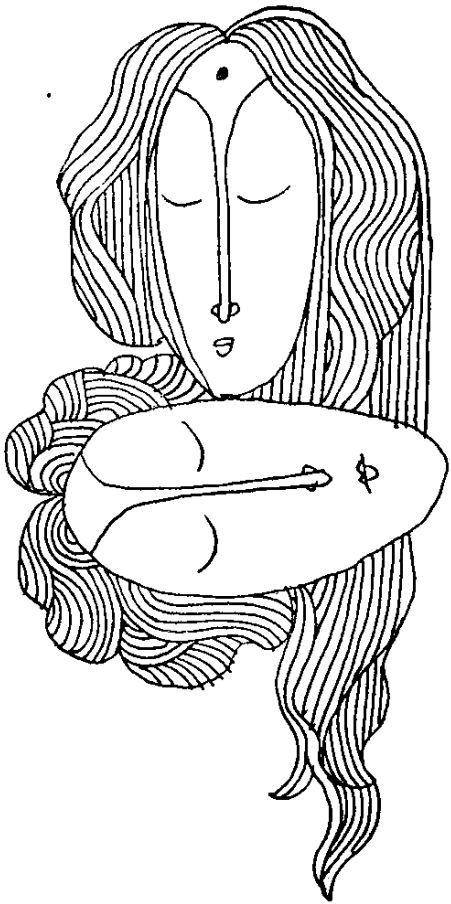

কথোপকথন ৩৩

খবর্দার! হাত সরিয়ে নাও।
ব্যাগে ভরে নাও টাকাগুলো।
আজ সমস্ত কিছুর দাম দেবো আমি।
কী হচ্ছে কি শুভংকর? কেন এমন পাগলামির ঢেউয়ে দুলছো
এইজন্যেই তোমার উপর রাগ হয় এমন।
মাঝে মাঝে অর্থমন্ত্রীদের মত গোঁয়ার হয়ে ওঠো তুমি।
কাল কতবার বলেছিলুম, চলো উঠি, চলো উঠি।
আকাশ আলকাতরা হয়ে আসছে, চলো উঠি।
এখুনি সেনাবাহিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়বে বৃষ্টি, চলো উঠি।
তুমি ঘাসের উপর বুড়ো বটগাছ হয়ে বসে রইলে।
কলকাতা ডুবল, তুমিও ডুবলে
আমাকেও ডোবালে।
কেন আমার কথা শোনো না বল তো?
আমি কি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি
যে সিংহাসনের হাতলে হাত রাখলেই হারিয়ে যাবো স্মৃতিহীন অন্ধকারে?
কলের জলের মত
ক্যালেণ্ডারের তারিখের মত
বন্যার গায়ে গায়ে খরার মত
আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি। এবং থাকবো।
তাহলে কেন আমার কথা শোনো না শুভংকর?

—বল তো কত বয়স হল তার?
—কার?
—যার মাথাভর্তি সবুজ দেবদারু চুল
যার টলমলে পা কেবল ভুল পথের কাঁটার উপরে
আঁকে রক্তের দাগ,
যার সমস্ত কথাই অস্পষ্ট, সন্ত্রাসবাদীদের মত সংকেতময় এবং বিস্ফোরক
যে কেবল হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় এমন বাগানে
যেখানে ফুলের গায়ে হাত ছোঁয়ালেই অট্টহাসির বিদ্যুৎ
যেখানে লতাগুল্মের আড়ালে পিছলে পড়ার গোলাপী গহ্বর
আর ফুসলিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার খর জলস্রোত।
বল তো কত বয়স হল তার?
—তিন বছর।
—তাহলে মনে আছে তিন বছর আগে ঠিক এইখানে
ঠিক এই রকম পাঁশুটে সন্ধ্যের সাড়ে পাঁচটায়
এইরকম আরশোলা রঙের ছেঁড়া পর্দার আড়ালে
তোমার আর আমার যৌথ উল্লাসের ঔরসে জন্ম হয়েছিল তার
তোমার প্রথম চিঠিতে তুমি যার নাম দিয়েছিলে, অসহ্য সুখ
আমার প্রথম চিঠিতে আমি যার নাম দিয়েছিলাম, নবজন্ম।

কথোপকথন ৩৫

—লোকে বলে শুনি সেলায়ে তোমার পাকা হাত
ছুঁচ দিয়ে লেখো কবিতা।

—গোয়েন্দা নাকি? আমার যা কিছু লুকোনো
জানতে হবে কি সবই তা?

—তর্ক কোরো না, জুড়ে দেবে কিনা এখুনিই
হৃৎপিণ্ডের ক্ষতটা।

—দিতে পারি তবে মজুরী পড়বে বিস্তর
জোগাতে পারবে অতটা?

—কাজ যদি হয় নিখুঁত, পাবেই মজুরী,
ভেবেছো পালাবো গর্তে?

—হৃৎপিণ্ডের ভিতরে থাকে যে ঝর্ণা
দিতে হবে স্নান করতে।

কথোপকথন ৩৬

তুমিই আমার ধ্বংস হবে তা জানলে
এমন করে কি ভাসাতাম ডিঙি নৌকো?
ভাসাতাম?
তুমি চলে যাবে সমুদ্রে আগে বলনি
তাহলে কি গায়ে মাখাতাম ঝড়-ঝঞ্ঝা?
মাখাতাম?
নুড়িতে-পাথরে নূপুর বাজিয়ে ছোট্ট
জলরেখা ছিলে, দুই হাত দিয়ে ধরেছি।
ধরা দিয়েছ।
এখন দুকূল ভরেছে প্রবাহে প্লাবনে
উঁচু মাস্তুলে জাহাজ এসেছে ডাকতে।
ওকে সাড়া দাও।

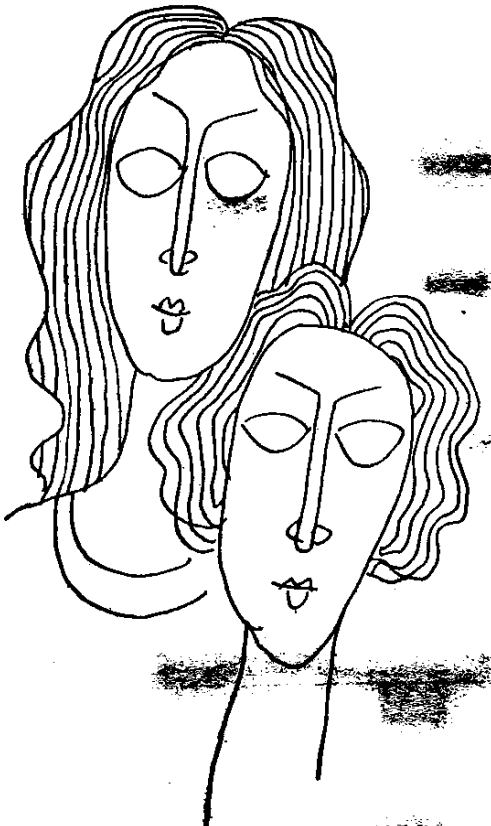

কথোপকথন ৩৭

ভালবাসা, সেও আজ হয়ে গেছে ষড়যন্ত্রময়।
নন্দিনী! এসব কথা তোমার কখনো মনে হয়?
চক্রান্তের মত যেন, সারা গায়ে অপরাধপ্রবণতা **মেখে**
একটি যুবক আজ যুবতীর কাছাকাছি এসে
সাদা রুমালের গায় ফুলতোলা শেখে।
যেন এই কাছে আসা **সমাজের** পক্ষে খুব বিপজ্জনক।
যেন ওরা আগ্নেয়াস্ত্র পেয়ে গেছে মল্লিকবাগানে
যেন ওরা হাইজ্যাকের নথিপত্র জানে
এসেছে বারুদ ভরে গোপন **কামানে।**

একটি যুবক যদি প্রতিদিন পাখি-রঙ বিকেলবেলায়
তার কোনো নায়িকার হাতে রাখে হাত
যেন এই কলকাতার মারাত্মক ক্ষতি করে দেবে বজ্রপাত।
কলকাতায় জঙ্গল গজাবে
কলকাতাকে সাপে-খোপে খাবে।
এই সব ফিস্‌ফাস্‌, চারিদিকে অবিরল এই সব
ছুঁচোর কেত্তন,
একটি যুবক এসে যুবতীর কাছাকাছি বসেছে যখন।

নন্দিনী! তোমার মনে পড়ে?
মামাশ্বশুরের মত বিচক্ষণ মুখভঙ্গী করে
একবার এক বুড়ো হাড় এসে প্রশ্ন করেছিল,
মেয়েটির সঙ্গে কেন এত মাখামাখি
মেয়েটির মধ্যে কোন গুপ্তধন আছে-টাছে নাকি?
লুকনো এয়ারপোর্ট আছে?
জাল-নোট ছাপাবার কারখানা আছে?
আন্তর্জাতিক কোন পাকচক্র আছে?
তাহলে কিসের জন্যে ছুঁচ ও সুতোর মত
শীত-গ্রীষ্ম এত কাছে কাছে?

কথোপকথন ৩৮

—নন্দিনী! আমার খুব ভয় করে, বড় ভয় করে।
কোনও একদিন বুঝি জ্বর হবে, দরজা-দালান ভাঙা জ্বর
তুষারপাতের মত আগুনের ঢল নেমে এসে
নিঃশব্দে দখল করে নেবে এই শরীরের অলিগলি শহর বন্দর।
বালিশের ওয়াড়ের ঘেরাটোপ ছিঁড়ে ফেলে তুলো
এখন হয়েছে মেঘ, উড়ো হাঁস, সাদা কবুতর।
সেইভাবে জ্বর এসে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে কোনো অন্য ভূমণ্ডলে
নন্দিনী! আমার খুব ভয় করে, বড় ভয় করে।

—বাজে কথা বকে বকে কি যে সুখ পাও, শুভংকর!
সত্যি বুঝি না।
কার জন্যে ছুরি নিয়ে খেলায় মেতেছো?
তুমি কি আমার মুখে রক্তদৃশ্য এঁকে দিতে চাও?

—ছুরি কই? ছুরি ছুঁড়ে দিয়েছি জঙ্গলে
খাঁ খাঁ দুপুরের মত লম্বা ছুরি ছিল বটে কিছুদিন আগে।
তখন যে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল
তখন যে যুদ্ধ-দাঙ্গা-লুটপাট-ডাকাতির সম্ভাবনা ছিল
এখন ভীষণ এক ভয় ছাড়া অন্য কোন প্রতিপক্ষ নেই।
যুদ্ধ নেই, কামানের তোপ নেই, অসুখ-বিসুখ কিছু নেই
ভয় ছাড়া অন্য কোন বীজাণুর মারাত্মক আক্রমণ নেই।

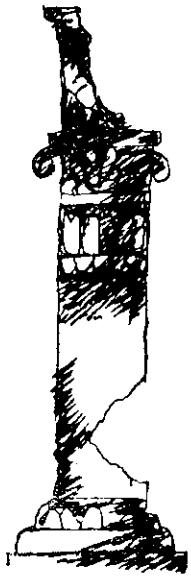

—আমার যা কিছু ছিল সবই তো দিয়েছি, শুভংকর!
তোমার বাঘের থাবা তাও ভরে দিয়েছি খাবারে।
চাঁদোয়ার মত ঘন বৃক্ষছায়া টাঙিয়ে দিয়েছি
মাথার উপরে, ঠিক আকাশের মাপে মাপে বুনে।
তবুও তোমার এত ভয়?
তবুও কিসের এত ভয়?

—সেই ছেলেবেলা থেকে যা ছুঁয়েছি সব ভেঙে গেছে।
প্রকাণ্ড ইস্কুলবাড়ি কাচের চিমনীর মত ঝড়ে ভেঙে গেল!
একান্নবর্তীর দীর্ঘ দালান-বারান্দা ছেঁড়া কাগজের কুচি হয়ে গেল।
কচি হাতে রুয়ে রুয়ে সাজিয়েছিলাম এক উৎফুল্ল বাগান
কুরে কুরে খেয়ে গেছে লাল পিঁপড়ে, পোকা ও মাকড়।
একটা পতাকা ছিল, আকাশের অদ্বিতীয় সূর্যের মতন
তর্কে ও বিতর্কে তাও সাতটা-আটটা টুকরো হয়ে গেল।
গাঁয়ের নদীকে ছুঁয়ে কী ভুল করেছি
নদীর ব্রীজকে ছুঁয়ে কী ভুল করেছি
কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র ছুঁয়ে আমি কী ভুল করেছি।
নন্দিনী!
তোমাকে যদি বাগান, পতাকা, ব্রীজ, কাগজের মতন হারাই?

কথোপকথন ৩৯

তোমাকে বাজাই
সমুদ্র-শাঁখ তুমি।
গাছে ফুল আসে
ফুলেরা কিশোরী হয়।
ডালপালাগুলো
সবুজ পাতার খামে
চিঠি লিখে লিখে
প্রেম নিবেদন করে।
ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরে
সমগ্র বনভূমি।
তোমাকে ভাসাই
মেঘের নৌকো তুমি
তুমি জান লাল
প্রবালের নীল দ্বীপ।
অমরাবতীর
দরজায় এসে নামো
খাট-পালঙ্ক
পেতে দেয় জ্যোৎস্নারা।
বুড়ি চাঁদ এসে
ঝাড়ি-লণ্ঠন জ্বালে।
পৃথিবীর ফাটা গালে
হেসে ওঠে পূর্ণিমা।

কথোপকথন ৪০

—ধরো কোনো একদিন তুমি খুব দূরে ভেসে গেলে
শুধু তার তোলপাড় ঢেউগুলো আজন্ম আমার
বুকের সোনালী ফ্রেমে পেনটিং-এর মতো রয়ে গেল।
এবং তা ধীরে ধীরে ধুলোয়, ধোঁয়ায়, কুয়াশায়
পোকামাকড়ের সুখী বাসাবাড়ি হয়ে যায় যদি?

—ধরো কোনো একদিন যদি খুব দূরে ভেসে যাই
আমারও সোনার কৌটো ভরা থাকবে প্রতিটি দিনের
এইসব ঘন রঙে, বসন্তবাতাসে, বৃষ্টিজলে।
যখন যেমন খুশী ওয়াটার কালারের আঁকা ছবিগুলো
অম্লান ধাতুর মত ক্রমশ উজ্জ্বল হবে সোহাগী রোদ্দুরে।

—তার মানে সত্যি চলে যাবে?

—তার মানে কখনো যাবো না।

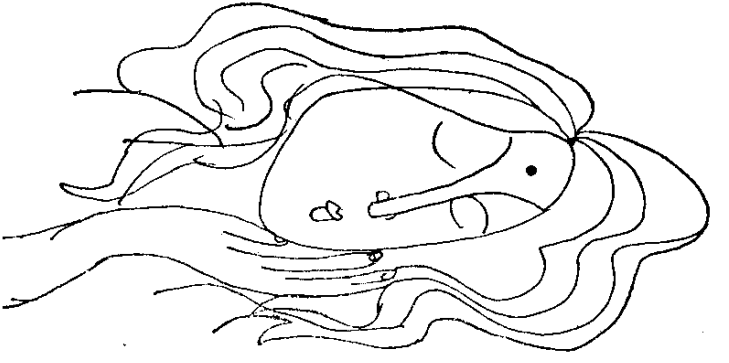

—বৃক্ষের বল্কল দেখে মনে হয় যেন আমাদের
কথোপকথনগুলো যাতে না হারায়
আশ্চর্য হরফে লিখে রেখেছে উল্কির মত নিজেদের গায়।
পৃথিবীর বৃক্ষগুলো মানুষের গোপনীয়তম
সমস্ত সংবাদ জানে, এমনকি তোমাকে যা কখনো বলিনি
হৃদয়ের সেই সব তূর্যনাদ আর্তনাদও জানে।

—নভোমণ্ডলের দিকে চেয়ে থেকে ঠিক এরকমই
ভেবেছি আমিও। যেন গোপন আলমারী ঘেঁটে-ঘুটে
তোমাকে যে-সব চিঠি লিখেছি, যা কখনো লিখিনি
নক্ষত্র-অক্ষরে যেন ছাপিয়ে রেখেছে তার সব
অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি।

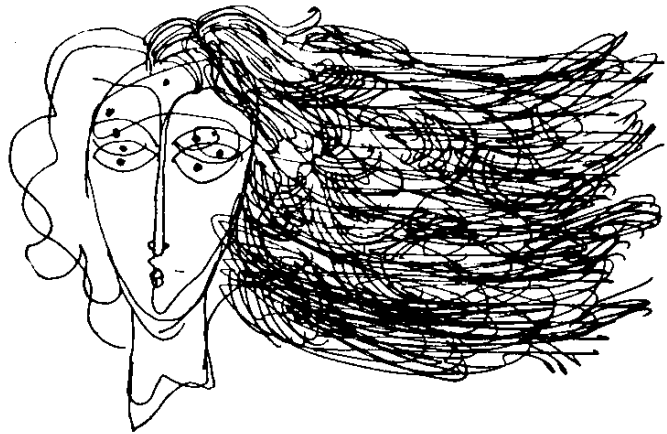

কথাসরিৎসাগর

পুষ্পদন্তী